The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXVI, No. 2, pp 79-95
ISSN 2306-3920, DOI :

ইংরেজ উপনিবেশে বাঙালি মুসলমানের উপন্যাস : জাতীয় চেতনা ও আত্মপরিচয়ের স্বরূপ

মো. মাসুদ পারভেজ*

[**সার-সংক্ষেপ :** বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নে মুসলমান ঔপন্যাসিকগণের উপন্যাস পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) প্রকাশের প্রায় পঁচিশ বছর পর মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) রচিত উপন্যাস *বিষাদ-সিন্ধু* (১৮৯১) প্রকাশিত হয়। তার পূর্বে বাঙালি মুসলমানের উপন্যাস রচনার ইতিহাস নেই। যদিও বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চার ইতিহাস বেশ পুরোনো। *বিষাদ-সিন্ধু* রচনার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের উপন্যাসের যে-যাত্রা শুরু হয় তা সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকেও বিষয়বস্তু হিসেবে যুক্ত করে। মূলত ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আত্মপরিচয় নির্মাণের যে-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় তার প্রভাব সমকালীন উপন্যাসের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী উপাদানের সরব উপস্থিতি ঘটে। এই আলোকে আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি মুসলমানের উপন্যাসে জাতীয় চেতনা ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতির স্বরূপ অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।]

বাঙালি মুসলমান শব্দদ্বয় দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ভাষা ও ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং যাদের ধর্ম ইসলাম। অর্থাৎ যারা ভাষিক পরিচয়ে (Language based identity) বাঙালি আর ধর্মীয় পরিচয়ে (Religion based identity) মুসলমান। সেক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় একই সঙ্গে দুটি জাতীয়তাবাদী উপাদান যথাক্রমে ভাষা (Language) ও ধর্ম (জবষরমরড়হ) দ্বারা নির্মিত। এই দুইটি উপাদান জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে, ব্যাপারটি তেমন নয়। কিন্তু ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতে জাতীয়তাবাদের যে-বয়ান (Discourse) তৈরি হয় তাতে লক্ষ করা যায়, ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয় নির্মাণের একধরনের প্রবণতা। উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাস রচনার সূচনালগ্নে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) প্রমুখ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে (পারভেজ, ২০২৪ : ১৩৩-১৫০)। এসকল ঔপন্যাসিকগণ তাঁদের উপন্যাসকে শুধু সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে আবদ্ধ না-রেখে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয় চেতনা নির্মাণের পরোক্ষ চেষ্টা করেন। উপন্যাস যে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে সে প্রসঙ্গে বেনেডিক্ট এন্ডারসন (Benedict Anderson) তাঁর *Imagined Community*

* **ড. মো. মাসুদ পারভেজ :** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-৩১১৪, ইমেইল : parvajm-bng@sust.edu

(1983) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (Anderson, 2006 : 22-30)। ফলে উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নে হিন্দু ঔপন্যাসিকগণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে-উপাদান উপন্যাসে ধারণ করেন এর বিপরীতে বাঙালি মুসলমান ঔপন্যাসিকগণের মধ্যেও ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয় চেতনাকে বিষয়বস্তু হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় জাতীয় চেতনার পাশাপাশি উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয় চেতনার উপস্থিতি ঘটে। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১, কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)— এঁদের উপন্যাসে জাতীয় চেতনা ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

জাতীয় চেতনার উন্মেষপর্বে উনিশ শতকীয় বাংলা উপন্যাসে হিন্দু জাতীয়তাবাদ নির্মাণ-চিত্রের পাশে মুসলমান ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু* (১৮৯১) উপন্যাসে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। *বিষাদ-সিন্ধু* হলো 'উনিশ শতকের ভারতবর্ষে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ মুসলমান জাতিকে নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস' (দাশগুপ্ত, ২০১৭ : ৪৬)। সে সময়ে ভারতের উপনিবেশিত মুসলমানেরা রাজক্ষমতা হারিয়ে, ইংরেজি-শিক্ষা থেকে নিজেদের বিচ্যুত রেখে দিগ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ছিল। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে এই অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে— একদিকে ইংরেজ শাসন আরেকদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নব্য-হিন্দু জমিদারদের শোষণ। এধরনের পরিপ্রেক্ষিতে আরবীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের ইতিহাস, কাহিনি ও মিথ প্রভৃতি ঘটনাবলি অবলম্বন করে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাস সম্পর্কে রাহুল দাশগুপ্ত *বাংলা উপন্যাসকোশ* গ্রন্থে বলেন :

> কোনো বিরুদ্ধ ধর্ম ও সম্প্রদায়কে আঘাত না করে, সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িকভাবে, মীর মশাররফ কিংবদন্তি ও ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর গৌরবময় অতীতকে তাদের অন্ধকারময় বাস্তবতার সামনে উত্তরণের সিঁড়ি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। (দাশগুপ্ত, ২০১৭ : ৪৬)

এক্ষেত্রে মুসলমানের সামনে আদর্শ হিসেবে হাজির করা হয়েছে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনকে। তাঁরা নিজের জীবনের বিনিময়ে ইসলামের আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন এবং মদিনার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শহিদ হয়েছেন। ঔপন্যাসিক নিজেও উপনিবেশিত-পরাধীন ছিলেন। তাঁর মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আখ্যানের মন্ত্রী হামান চরিত্রটির মধ্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায়। স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মন্ত্রী হামান বলে :

> রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজ-বিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিদ্রোহনল প্রজ্জ্বলিত হইলেও যথাসময়ে অবশ্যই নির্ব্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়া দিলে সে দুর্দমনীয় তেজও একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া যায়। মহামারী, জলপ্লাবন ইত্যাদি দৈবদুর্ব্বিপাকে রাজ্য ধ্বংসের উপক্রম বোধ হইলেও নিরাশাসাগরে ভাসিতে হয় না—আশা থাকে। রাজার মজ্জাদোষে, কি মন্ত্রণার অভাবে রাজ্যশাসনে অকৃতকার্য্য হইলেও আশা থাকে। মূর্খ রাজার প্রিয়পাত্র হইবার আশায় মন্ত্রণাদাতাগণ অবিচার, অত্যাচার নিবারণে উপদেশ না দিয়া অহরহ তোষামোদের ডালি মাথায় করিয়া প্রতি আজ্ঞা অনুমোদন করাতেই যদি রাজা প্রজায় মনান্তর ঘটে, তাহাতেও আশা থাকে—সে ক্ষেত্রেও আশা থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা-ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও আর সে মহামূল্য রত্ন হস্তগত হয় না। স্বাধীনতা-সূর্য্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা। (হোসেন, ২০১৫ : ৩৪৫)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ভূখণ্ড যখন অন্যভূখণ্ডের শাসকের দ্বারা অধীকৃত বা দখল হয় আর সেই দখলীকৃত ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠী দখলকারী দ্বারা শাসিত হয় এবং তাদের নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার হারায় তখন তারা পরাধীন জাতি হিসেবে পরিচিতি পায়। ঔপন্যাসিক পরাধীন জাতির হওয়ায় স্বাধীনতার গুরুত্বের বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আখ্যানে ধর্মীয় ঘটনার অভ্যন্তরে স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি বারবার উত্থাপিত হয়েছে এভাবে :

ক. ...জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বিধর্মীর অস্ত্রে যদি আত্মবিসর্জ্জন হয়, তাহাতেও অক্ষয় স্বর্গলাভ। ... হয় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মোহাম্মদীয় ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিব, না হয় অকাতরে রক্তস্রোতে আমাদের এই অস্থায়ী দেহ খণ্ডে খণ্ডে ভাসাইয়া দিব। (হোসেন, ২০১৫ : ৪৯)

খ. এলাহি! আজ আপনার নামের উপর নির্ভর করিয়া হাসানকে শত্রু-সম্মুখে দিলাম। হাসানের প্রাণ, পবিত্র ভূমি মদিনার স্বাধীনতা এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিতে ভ্রাতা, পুত্র ও স্বামীহারা হইলে আমরা কাতরা হইব না। (হোসেন, ২০১৫ : ৫১)

গ. স্বাধীনতা—কি মধুমাখা কথা! স্বাধীন জীবন কি আনন্দময়! স্বাধীন দেশ কি আরামের স্থান! স্বাধীন ভাবের কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের সূক্ষ্মশিরা পর্য্যন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠে এবং অন্তরে বিবিধ ভাবের উদয় হয়। হয় মহাহর্ষে মন নাচিতে থাকে, না হয় মহাদুঃখে অন্তর ফাটিয়া যায়। স্বাধীন মন, স্বাধীন জীবন, পরাধীনতা স্বীকার করিতে যেরূপ কষ্টবোধ করে, আবার অন্যকে অধীনতা স্বীকার করাইতে পারিলে ঐ অন্তরেই অসীম আনন্দ অনুভব হয়। (হোসেন, ২০১৫ : ২০৮)

ঘ. '... পবিত্র ভূমি মদিনার স্বাধীনতা-সূর্য্য হরণ করিয়া চিরপরাধীনতার অন্ধকার-অমানিশায় অবারিত করিতে [এজিদ বাহিনী] সসৈন্যে মদিনায় আসিয়াছিল।' (হোসেন, ২০১৫ : ৩৩০)

আখ্যানে ধর্ম রক্ষার পাশাপাশি 'জন্মভূমির স্বাধীনতা', 'মদিনার স্বাধীনতা', 'পবিত্র ভূমি মদিনার স্বাধীনতা-সূর্য্য' রক্ষা করার প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে জন্মভূমির গুরুত্ব সমানভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণিত আছে, জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— স্বদেশপ্রেম। আর এই স্বদেশপ্রেম থেকে জাতীয় চেতনার উন্মেষ প্রসঙ্গে সালজবাখ বলেন, 'National consciousness grows out of affection for the native soil.' (Salzbach 1943 : 78)। বলা যায়, ব্যক্তিমনে মাতৃভূমি বা জন্মভূমির সংকটে শহিদ হওয়ার নিঃস্বার্থ আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি থেকে জাতীয় চেতনার উন্মীলন ঘটে। উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, দামেস্কর শাসনকর্তা এজিদ মদিনা দখল করে তাঁর শাসন জারির জন্য সৈন্য পাঠায়। এজিদের বাহিনির হাত থেকে মদিনাকে রক্ষার জন্য মদিনাবাসীর আত্মত্যাগের চিত্রে জাতীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয় হয়ে ওঠে :

ক. ধর্মরক্ষা ও

খ. জন্মভূমি/স্বদেশ রক্ষা

জন্মভূমি বা স্বদেশ বহিঃশত্রু দ্বারা দখল হলে দখলদার শাসকের ধর্ম প্রাধান্য পায় ও তার আইন দ্বারা শাসিত হয়। এ দৃশ্য ভারতবর্ষে লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতীয়রা শাসন ক্ষমতা হারিয়ে পরাধীন জীবন পায়। ভারতীয়দের পরাধীনতা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে মদিনাবাসীর বীরত্ব ও স্বদেশ চেতনাকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। আখ্যানে দখলদারি বহিঃশত্রু এজিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মদিনাবাসীর যুদ্ধ যেন ভারতীয়দের ইংরেজের বিরুদ্ধে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার আহ্বান। স্বদেশচেতনার সঙ্গে জাতীয় ধর্ম বিষয়টিও উপন্যাসে উঠে এসেছে এভাবে :

> ভাতৃগণ! যদি জাতীয় ধর্ম্ম-রক্ষার বাসনা থাকে, জগতে মোহাম্মদীয় ধর্ম্মের স্থায়িত্ব রাখিতে ইচ্ছা থাকে, কাফেরের রক্তে ইসলাম অস্ত্র রঞ্জিত করিতে ইচ্ছা থাকে, আর প্রভু মোহাম্মদের প্রতি যদি অটল ভক্তি থাকে, তবে এই পত্র প্রাপ্তি মাত্র আপন আপন সৈন্যসহ মদিনা প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হউন। (হোসেন, ২০১৫ : ২২৩)

আখ্যানে বর্ণিত জাতীয় ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলাম ধর্ম রক্ষার জন্য আবু হানিফা ইরাক, আঞ্জাম, তোগান নগরের শাসককে আহ্বান জানিয়েছে। ধর্ম রক্ষার এই চেতনার মধ্যেও জাতীয়তাবাদের ভাব বিদ্যমান। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ইসলামকে জাতীয় ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন নগর, রাজ্য বা দেশের মোহাম্মদীয় উম্মতদের মধ্যে যে-সংহতি স্থাপন করা হয়েছে—তা ইসলামি জাতীয়তাবাদকে নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে জাতীয় ধর্ম প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে-'রেপ্রিজেন্টেশেন' (পারভেজ, ২০২৪ : ১৩৯-১৫০) তার 'কাউন্টার' হিসেবে মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসে মুসলিম জাতীয়তাবাদী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সমালোচকের মতে, 'আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বল্পশিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের মানস-জগতের মৌলিক-বিন্দুকে' (খান, ২০১৫ : ছয়) এ আখ্যান এমনভাবে ধারণ করেছিল যে—"বাঙালি হিন্দু সমাজে যেমন 'রামায়ণ' ঠিক তেমনি বাঙালি মুসলমান সমাজে ছিল 'বিষাদ-সিন্ধু'।" (খান, ২০১৫ : ছয়)। বলা যায় যে, বাঙালি মুসলমান *বিষাদ-সিন্ধু*র কারবালার হৃদয় বিদীর্ণ ঘটনা, ইসলামি মিথ, কাহিনি ও বীররস ইত্যাদি অনুষঙ্গ দ্বারা নিজের ভেতর একধরনের কল্পিত-বন্ধন (imagined community) তৈরি করেছে। এ বিষয়ে বেনেডিক্ট এন্ডারসন (Benedict Anderson) জাতিকে 'imagined political community' হিসেবে ধরে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি জাতিকে *imagined*, *limited*, *sovereign*, *community* এই চার বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে (Anderson, 2006 : 6-7):

1. It is *imagined* because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion.
2. The nation is imagined as *limited* because even the largest of them, encompassing perhaps a billion living human beings, has finite, if elastic boundaries, beyond which lie other nations.
3. It is imagined as a *sovereign* because the concept was born in an age in which Enlightenment and Revolution were destroying in the legitimacy of the divinely-ordained, hierarchical dynastic realm.
4. It is imagined as a *community*, because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship.

এন্ডারসনের ভাষ্যমতে, জাতিকে 'কল্পিত', 'সীমিত', 'সার্বভৌম' ও 'সম্প্রদায়' হিসেবে উল্লেখের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, একেবারে ক্ষুদ্রতম জাতির সদস্যরাও তাদের অধিকাংশ সদস্যদের কখনোই চেনে না, পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় না এমনকি ভাব বিনিময়ও হয় না, তবুও তাদের সবার মনে নিজ সম্প্রদায়ের একটি প্রতিচ্ছবি জীবন্ত থাকে। আবার একটি জাতি জনংখ্যার বিবেচনায় যতই বৃহদাকার হোক না কেন এর সীমানার আয়তনের বাইরে অন্য জাতি থাকে, সে অর্থে এটা সীমিত। যেহেতু এনলাইটেনমেন্ট ও বিপ্লবের কালে রাজবংশীয় শাসন ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে জাতির উদ্ভব ঘটেছিল তাই ইহাকে সার্বভৌম হিসেবে কল্পনা করা হয়। আর জাতিকে সম্প্রদায় বলা হয়েছে, কারণ বিদ্যমান অসমতা ও শোষণ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা 'কমরেডশিপের' ভূমিকায় থাকে।

এন্ডারসনের ভাষ্য-অনুযায়ী বলা যায় যে, কারবালার হৃদয় বিদারক করুণ ঘটনা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের কল্পিত-বন্ধনের অনুভূতি ও বোধ জাগ্রত করে। এ বিষয়টি ভারতবর্ষের মুসলমানের মধ্যে প্রথম-বিশ্বযুদ্ধকালীন খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়— যা ছিল সাধারণ মুসলমানের অনুভূতিপ্রসূত। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেন :

> ১৯১৪ সালে ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যেকার যুদ্ধে তুর্কী জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করায় [ভারতীয়] মুসলমানদের চেতনার মধ্যে এক নিদারুণ টানা-পোড়েন ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছিলো। একদিকে নিজেদের স্বার্থের জন্য ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের খলিফা হিসেবে তুর্কীর সুলতানের প্রতি আনুগত্য— এই দুই-এর দ্বন্দ্ব মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের সূচনা করে এবং শেষপর্যন্ত মুসলমানদের ব্যাপকতম অংশ সুলতানের নেতৃত্বাধীন খেলাফতকে রক্ষার জন্য ব্রিটিশ-বিরোধিতার পথ গ্রহণ করে। (উমর, ২০১৮ : ৭৮)

মুসলমানের পক্ষ অবলম্বনের এই বিষয়টিতে ধর্মীয় চেতনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন এই অনুভূতিকে আশ্রয় করে ইমাম হোসেন ও এজিদ সম্পর্কে সাধারণ ধার্মিক মুসলমানের মনে প্রচলিত ধারণাকে আখ্যানের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর ফলে সৃষ্ট ধর্মীয় আবেগ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছে— যা ইসলামী জাতীয় চেতনার রূপ ধারণ করেছে।

উনিশ শতকে রমেশচন্দ্র দত্তের *বঙ্গবিজেতা* (১৮৭৪), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৮৭৫), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* (১৮৮২); *দেবী চৌধুরানী* (১৮৮৪); *সীতারাম* (১৮৮৭) ও *রাজসিংহ* (১৮৯৩) আখ্যানে সৃষ্ট হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার বিপরীতে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছে মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসে।

পরবর্তী সময়ে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৃষ্ট সংকট ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম ত্বরান্বিত করে, ফলে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের উত্থান ঘটে এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ তিরিশের দশকে তা কংগ্রেসের বিপরীত-রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ হতাশায় পর্যুবসিত হয়। এ ধরনের রাজনৈতিক আবহে ইসমাইল হোসেন সিরাজী *রায়নন্দিনী* (১৯১৫) উপন্যাস রচনা করেন।

রায়নন্দিনী উপন্যাসে সামন্ত আমলের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহিংস সম্পর্ক এবং বাংলার বারো ভুঁইয়ার নেতা ঈসা খাঁ ও কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর প্রেমকাহিনি বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেয়েছে। মুসলমান শাসক ও হিন্দু রাজকন্যার মধ্যে প্রেম ও মিলন এই উপন্যাসের অন্যতম দিক। এধরনের বিষয়বস্তু হিসেবে বাংলা উপন্যাস রচনার সূচনালগ্নে ঘটেছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *অঙ্গুরীয় বিনিময়* (১৮৫৮) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) আখ্যানে স্থান পেয়েছে। *অঙ্গুরীয় বিনিময়* উপন্যাসে শিবাজী ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা রোশনারার প্রেম কাহিনি এবং *দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাসে মুসলিম রাজকন্যা আয়েষার সঙ্গে রাজপুত বীরের প্রেমকাহিনি স্থান পেয়েছে। এর বিপরীত চিত্র ইসমাইল হোসেন সিরাজী *রায়নন্দিনী* উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ মুসলমান রাজার সঙ্গে হিন্দু রাজকন্যার প্রেম। এ ধরনের বিষয় নির্ধারণের কারণ হিসেবে তিনি বলেন :

> একই দেশের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব থাকা সর্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী ভ্রাতারা কাল্পনিক আর্যামীর গৌরব-গানে বিভোর হইয়া কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় লেখনী পরিচালনায় দারুণ অসদ্ভাবের বীজ রোপন করিতেছেন। দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্মবোধ

> জন্মাইবার জন্যই, উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায় "রায়নন্দিনী" রচনা করিয়াছি। (সিরাজী, ২০১৪ : ১৮)

ঔপন্যাসিকের ভাষ্যে 'মুসলমানদের আত্মবোধ জন্মাইবার জন্যই'— মন্তব্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে। এর দ্বারা ঔপন্যাসিক মুসলমানের মনে জাতীয় চেতনাকে উন্মোচন করার আকাঙ্ক্ষা বোধ করেছেন। ফলে তিনি উনিশ শতকের ঔপন্যাসিকদের হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছেন। তিনি 'বাঙ্গালী' লেখক হিসাবে উনিশ শতকের আর্যবাদী ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দুত্ববাদী মনোভাব পোষণ করা হিন্দু লেখক যেমন : ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বুঝিয়েছেন। এ সকল বিষয়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি উপন্যাসে মুসলিম গৌরবগাথা তুলে ধরেছেন।

রায়নন্দিনী উপন্যাসে বাংলার বারো ভুঁইয়ার অন্যতম প্রধান মুসলমান শাসক ঈসা খাঁর সঙ্গে কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর[১] এবং মাহতাব খাঁর সঙ্গে রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যা অরুণাবতীর প্রেম ও মিলন দেখানোর উদ্দেশ্যে প্লট তৈরি করেছেন ঔপন্যাসিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসে একজন হিন্দু রাজকন্যা মুসলমান শাসকের ব্যক্তিত্বগুণে আকৃষ্ট হয়ে তার প্রেমে পড়েছে এবং পিতৃধর্ম ত্যাগপূর্বক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। আখ্যানের প্লট মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামল এবং রচনাকাল বঙ্গভঙ্গ রদের পরবর্তী সময়—যা বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে বাংলা অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্পর্কের মেরুকরণ ঘটেছে। আখ্যানে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া-চিত্র প্রত্যক্ষ রূপ লাভ না করলেও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিদ্বেষপূর্ণ উপস্থাপনের মধ্যে তা বিদ্যমান। যদিও ঔপন্যাসিক বলেছেন, উনিশ শতকের হিন্দু ঔপন্যাসিকদের মুসলমান বিদ্বেষী আখ্যানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাঁর এই উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের ভাষ্যমতে :

> বাঙ্গালী লেখকগণের যত্ন এবং চেষ্টায় বাংলা ভাষা আজ ভারতের সর্বপ্রধান ভাষায় পরিণত। বাংলা ভাষায় ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের গ্রন্থ যতই সামান্য হউক, কিন্তু উপন্যাস এবং নাটক নভেলে বাংলা ভাষা আজ ভারাক্রান্ত। আর সেই সমস্ত গ্রন্থের পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে মুসলমানের অলীক কলঙ্ক, কুৎসা এবং বিজাতীয় বিদ্বেষ এবং ঘৃণা পরিপূর্ণ। উপন্যাসগুলি মোসলেম বিদ্বেষের অনলকুণ্ড। সে অনলকুণ্ডে বিরাট-কীর্তি, বিপুল-যশা, সিংহতেজা মুসলমান জাতির গোলাম হইতে সম্রাট নবাব এবং বেগম ও শাহজাদীগণ পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীদিগের পূর্বপুরুষগণ অবলুণ্ঠিত মস্তকে যাঁহাদের পদধূলি শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, নিখিল জগৎ যে মুসলমানের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, যাঁহাদের চরিত্র প্রভায়, জ্ঞান-গরিমায় এবং বীর্য-মহিমায় সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল-হায়! আজ সেই বিশ্বপূজ্য মুসলমান, বাঙ্গালী লেখকদিগের অপার কৃপায় অতি ঘৃণিত পিশাচ এবং অস্পর্শ্য কাম-কুক্কুররূপে চিত্রিত এবং বর্ণিত! হায়! যে নূরজাহান, রেজিয়া সোলতানা, জেবুন্নেছা, জাহানারা, মমতাজ মহল, দৌলতুন্নেসা প্রভৃতি বেগম ও শাহজাদীগণের পুণ্যপ্রতিভায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোকিত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহাদের নামকরণেও পুণ্য সঞ্চার হয়, হায়! সেইসব বিদুষী পূতচরিত্রা সম্মানিতা মহিলাদিগকেও যারপরনাই হীন চরিত্রা এবং হিন্দু-প্রেমোন্মাদিনী রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে! এ অত্যাচার, এ অবিচার একেবারেই অসহ্য! এ যন্ত্রণা একেবারেই মর্মন্তুদ! (সিরাজী, ২০১৪ : ১৭)

---

১. ইতিহাসে বর্ণিত তথ্যানুযায়ী স্বর্ণময়ী রাজা চাঁদ রায়ের কন্যা। উপন্যাসে তাকে কেদার রায়ের কন্যা বলা হয়েছে। (আহসান, ২০১৪ : ৭)

ইসমাইল হোসেন সিরাজী *রায়নন্দিনী* উপন্যাস যে-সময় রচনা করেন, সে-সময়ে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে সমকালীন হিন্দু ঔপন্যাসিকগণ স্বাধীন ভারতের আকাঙ্ক্ষা থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে উপন্যাসের প্লট হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে উপনিবেশ-বিরোধী চেতনা স্ফুরিত হয়। বলা যায়, তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সে হিসেবে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উনিশ শতকের উপন্যাসিকগণের হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরার প্রয়াসকে বলা যায়, বিশ শতকের প্রারম্ভে উন্মেষ হওয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিভাজিত রূপ।

উপন্যাসে মহররম উৎসব স্মরণ করার মাধ্যমে মুসলমানদের মনে জাতীয় চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে :

> মহররমের দশ দিন দিগ্বিজয়ী বিরাট বিশাল মুসলমান জাতির জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রভাব প্রকাশ পাইত। মুসলমান এই দশ দিন বাহুতে শক্তি, মস্তিষ্কে তেজ, হৃদয়ে উৎসাহ এবং মনে আনন্দ লাভ করিতেন। (সিরাজী, ২০১৪ : ৭৩)

মহররম প্রসঙ্গটির সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে আছে। সে অর্থে মহররমের দশ দিন মুসলমানের চেতনাকে উজ্জীবিত করার বিষয় হিসেবে উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জাতির সংকট মুহূর্তে জনগণের মনে জাতীয় চেতনার জন্য সংহতি প্রকাশ পায়। আর সেক্ষেত্রে অতীত বা বর্তমানের জাতীয় গৌরবোজ্জ্বল কোনো ঘটনা অথবা শোকগাথা জাতীয় চেতনা সৃষ্টিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। *রায়নন্দিনী* আখ্যানে কারবালাকে[২] কেন্দ্র করে মুসলমানের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বীরত্বগাথার মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানকে উজ্জীবিত করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে— যা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— নিজ-ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ও অপরের ধর্মকে হেয় করার প্রবণতা। আখ্যানে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য শ্রীপুরেশ্বরের হিন্দুধর্মের কুলগুরু মহাপণ্ডিত সার্বভৌম যশোদানন্দ ঠাকুরের সঙ্গে মুসলমান শাহ্ সোলতান সুফি মহীউদ্দীন কাশ্মীরীর বিতর্ক আয়োজন করা হয়। সে বিতর্কে যশোদানন্দ ইসলাম ধর্ম ও সুফিকে নানারকম কুৎসা কীর্তন ও বাক্যবাণে আক্রমণ করে। সুফি এর কোনো প্রতি-উত্তর না দিয়ে আসরের নামাজ আদায়পূর্বক উপস্থিত সকল মুসলমান-সহকারে উচ্চস্বরে কালেমা পাঠ করে এবং পণ্ডিত যশোদানন্দের দিকে তর্জনী তুলে তিনবার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, 'হে যশোদানন্দ! তুমি সত্য গ্রহণ কর' (সিরাজী, ২০১৪ : ১০০)। যশোদানন্দ কালেমা পাঠ করে এবং মুসলমান হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। তার হিন্দু থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে এভাবে :

> যশোদানন্দ কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হযরত, আমাকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন। ধর্মের আগুন আমার প্রাণের ভিতরে জ্বলে উঠেছে; আমার পাপ অন্তঃকরণ দগ্ধ হচ্ছে! আমি আর কাঠ-পাথরের পূজা করব না।" এই বলিয়া ঠাকুর দীক্ষিত হইবার জন্য বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ ও আরও গভীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। (সিরাজী, ২০১৪ : ১০০)

উদ্ধৃতিতে একজন হিন্দু কুলগুরু মহাপণ্ডিত যশোদানন্দের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে মূলত ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। উপন্যাসের এ ঘটনা উনিশ শতকের ঔপন্যাসিকগণের হিন্দু

---

২. কারবালার ঘটনা দ্বারা মুসলমানের মধ্যে জাতীয় চেতনা তৈরির ভূমিকা প্রসঙ্গে মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের 'কাউন্টার' হিসেবে উঠে এসেছে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের উপন্যাসে চিত্রিত হিন্দু-মুসলমানের লড়াই এ উপন্যাসেও লক্ষ করা যায়। আখ্যানে দাক্ষিণাত্যে রাজা রাম রায় ও সোলতান হোসেন নিজাম শাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে বাংলার বারো ভুঁইয়ার নেতা ঈসা খাঁ মুসলমান সুলতানকে সাহায্য করার উদ্দেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'মুসলমান সৈন্য জেহাদের নামে ও হিন্দু সৈন্য রাজ্যরক্ষাকল্পে মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল' (সিরাজী, ২০১৪ : ৯৬)। জেহাদ অর্থে সাধারণত ধর্মযুদ্ধ বোঝানো হয়। উপন্যাসে এ যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে :

> মোসলেম বীরগণ "আল্লাহু আকবর" রবে আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এইরূপে তালিকোট যুদ্ধে বিজয় লাভান্তে বিজয়নগর অধিকৃত হইল। রাম রায়ের অদূরদর্শিতা এবং ঔদ্ধত্যের ফলে বিজয়নগর হিন্দু-শাসনের তামসী ছায়া হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া ঐসলামিক সুশাসনের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল। (সিরাজী, ২০১৪ : ৯৯)

ঐতিহাসিকভাবে প্রতীয়মান যে, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে যুদ্ধে জয়ী শাসকের ধর্মই প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। আখ্যানে মুসলমান শাসককে জয়ী করার মাধ্যমে ইসলামি জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে *রায়নন্দিনী* উপন্যাসে ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী উপস্থাপনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিপরীতমুখী অবস্থান তৈরি করেছে। কারণ এ সময়ে স্বদেশি আন্দোলনকেন্দ্রিক ব্রিটিশ-বিরোধী বা উপনিবেশ-বিরোধী প্রচারণা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। উপনিবেশ-বিরোধী এই সংগ্রাম-চিত্র কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসেও লক্ষ করা যায়।

কাজী নজরুল ইসলামের *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০) উপন্যাসে মুসলমান বিধবা নারীর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা এবং আনসার নামক যুবকের ইংরেজ-বিরোধী চেতনা বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেয়েছে। এই উপন্যাস রচনার পটভূমি সম্পর্কে জানা যায়, জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের পর কাজী নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে এক খ্রিস্টান নারীর বাড়িভাড়া নেন। নিম্নজীবী মুসলমান ও খ্রিস্টানদের বাস ছিল সেখানে। এই পরিবেশে তিনি *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসে বর্ণিত কৃষ্ণনগরের ঘটনা বাস্তবিক অর্থে ঔপন্যাসিকের দেখা।

উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নে হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্সের *ফুলমণি ও করুনার বিবরণ* (১৮৫২) ও টেকচাঁদ ঠাকুরের *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) আখ্যানে দেশীয় নরনারীকে খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত করার চিত্র লক্ষ করা যায়। এ বিষয়টি আরও প্রকটভাবে উঠে এসেছে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে। আখ্যানে অসহায় ও দারিদ্রক্লিষ্ট নারী ও শিশুদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেবা ও পয়সা দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্মান্তরিত করেছে। সেজ-বৌয়ের অসুস্থতার সংবাদে পাদ্রী সাহেব বলে, 'হামি টোমাদের কষ্ট শুনিয়া আসিয়াছে। টোমাডের কে পীরিট আছে, টাহাকে ঔষুধ ডিবে!' (ইসলাম, ১৯৯১ : ৪০) ঔষুধের পাশাপাশি মেম সায়েব যাবার বেলায় তাকে এক টাকাও দিয়ে যায়। এর ফলে মেজ-বৌ বলে, 'ঝ্যাঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াত-কুটুমের মুখে! সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়।' (ইসলাম, ১৯৯১ : ৪১) মেম সাহেবের ঔপনিবেশিক মিশনারি কর্ম উপলব্ধি করা উপনিবেশিত মেজ-বৌয়ের দ্বারা সম্ভব নয়। 'সুচতুরা ইংরেজ মেয়ে' মিস জোন্স এক্ষেত্রে কৌশলী হয়ে মেজ-বৌয়ের উদ্দেশ্যে বলে :

> ... আমি টোমার মনের কঠা বুজেছে। টোমাকে একেবারে যেটে হ'বে না সেখানে। ক্রীশ্চানও হ'টে হবে না! টুমি শুধু রোজ সকালে একবার ক'রে যাবে। আবার ডুপুরে চলে আসবে। (ইসলাম, ১৯৯১ : ৫৬)

খ্রিস্টান মিশনারিরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে উপনিবেশিতদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশিতদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে সেখানকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ ধরনের চিত্র *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে এভাবে :

> মিশনারীরা ওদের ধর্ম্মপ্রচারের জন্য হয়ত একটু গায়ে পড়েই দরিদ্র মুসলমান ও হিন্দুদের অসুখ-বিসুখে ওষুধ-পত্তর দিয়ে সাহায্য করে এবং তারা অনেককে তাদের ধর্ম্মে দীক্ষিতও করতে পেরেছে! (ইসলাম, ১৯৯১ : ৭২)

ব্রিটিশরা এদেশে বাণিজ্য বিস্তার ও ক্ষমতা দখলের পাশাপাশি বিভিন্ন কৌশলে খ্রিস্টধর্মও প্রচার করেছে। আখ্যানে তারা মেজ-বৌ, প্যাঁকালের মতো অভাবক্লিষ্ট নর-নারীদেরকে তাদের লক্ষ্য বানিয়েছে। এ ধরনের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসে ইংরেজ মিশনারির খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিপরীতে মুসলমান মোল্লাদের উপস্থিতি ঘটেছে। মোল্লারা খ্রিস্টান মিশনারির সঙ্গে মেজ-বৌয়ের মেলামেশার কারণে তার পরিবারকে একঘরে করে দেয়। তারা খ্রিস্টান মিশনারির ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কার্যকলাপকে 'বে-ঈমান নাসারাদের বজ্জাতি' (ইসলাম, ১৯৯১ : ৭৩) হিসেবে উল্লেখ করেছে। মিশনারিদের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করা। সেক্ষেত্রে মিশনারির বিপরীতে মোল্লাদের এমন কর্মকাণ্ডে উপনিবেশ বিরোধিতার চিত্র উপস্থাপিত হয়। উপন্যাসে মিশনারি মিস জোন্স মেজ-বৌকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার পর 'পাড়ার পুরুষ-মেয়ে সবাই বলতে লাগল, এইবার মাগীরা মেজ-বৌকে 'আড়কাঠি' ক'রে সব বৌ-ঝিকে 'খেরেস্তান ক'রে তুলবে!' (ইসলাম, ১৯৯১ : ৭৩)। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ঔপনিবেশক শাসকের হাত থেকে নিজ ধর্ম রক্ষার জন্য মুসলমান মোল্লারা মেজ-বৌকে 'একঘরে' করার কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে— যা উপনিবেশ-বিরোধী চেতনার প্রেক্ষাপটকে হাজির করেছে। যদিও এ ধরনের সিদ্ধান্ত মোল্লাদের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ তবে এক্ষেত্রে তা খ্রিস্টান মিশনারির হাত থেকে নিজের ধর্মকে রক্ষা করার প্রচেষ্ট হিসেবে গণ্য করা যায়।

উপন্যাসে খেলাফতি ভলান্টিয়ারের পোশাক পরিধানরত অবস্থায় আনসার চরিত্রটির আগমন ঘটেছে। ভারতবর্ষে খেলাফত আন্দোলন মূলত ব্রিটিশদের বিরোধিতা করে সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তুরস্কের সঙ্গে ব্রিটিশদের লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় মুসলমানেরা ইসলামি খেলাফত রক্ষার জন্য ইংরেজের বিপক্ষে খেলাফত আন্দোলন শুরু করে। আখ্যানে আনসার ব্রিটিশ বিরোধিতা করে খেলাফতি আন্দোলনে যুক্ত হয়। আনসারের ব্রিটিশ-বিরোধী চেতনা থেকে লতিফার ছেলে আমীর তার রিভলবার নিয়ে বলে, "বুঝলে মা, আমি এইটে নিয়ে যুদ্ধ ক'রতে যাব। মামা আর আমি ইংরেজকে একেবারে এই গুডুম!" (ইসলাম, ১৯৯১ : ৬৩)। ইংরেজকে 'গুডুম' করার যে-আকাঙ্ক্ষা আমীরের মধ্যে দেখা যায়, তা ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, এই খেলাফত আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। যার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধাচার ও অসহযোগিতা করা। ইংরেজ-বিরোধী এ ধরনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইংরেজকে 'গুডুম' করার বিষয়টিতে লক্ষ করা যায় উপনিবেশ-বিরোধী চেতনা। আনসারের কথায় তা আরও স্পষ্ট হয়েছে— 'সে বলে, সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না' (ইসলাম, ১৯৯১ : ৬৬)। দেশ স্বাধীন করার জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী তৈরি করা। এই আকাঙ্ক্ষা থেকে সে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচার করেছে। কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচার ও বিপ্লবী প্রস্তুত করার কারণে ইংরেজ সরকার তাকে গ্রেফতার করেছে।

মৃত্যুক্ষুধা সংক্ষিপ্ত পরিসরের উপন্যাস হলেও এর কাহিনিতে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের মধ্যে ধর্মীয় আধিপত্যবাদী চিত্র লক্ষ করা যায়। এটা ঔপনিবেশিক শাসকদের একটি প্রকল্প।

এর বিরুদ্ধতায় সৃষ্ট অবস্থান থেকে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে উপনিবেশ-বিরোধী চেতনার উপস্থিতি ঘটেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের *কুহেলিকা* (১৯৩১) উপন্যাসেও উপনিবেশ বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে *কুহেলিকা* উপন্যাস রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে বিপ্লববাদ স্বদেশি আন্দোলনের পূর্বেই জন্ম নেয় এবং বিপ্লবীরা ভারতকে স্বাধীন করার দীক্ষা গ্রহণ করে। তবে বিপ্লববাদ সম্পর্কে বলা হয়, এতে মুসলমান যুবকদের অংশগ্রহণ প্রায় ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লববাদে মুসলমান যুবক জাহাঙ্গীরের অংশগ্রহণ ও বিপ্লবীদের স্বদেশপ্রেমের চেতনা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। বিপ্লববাদ সম্পর্কে নজরুলের মনোভাব নিয়ে সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর *নজরুল-চরিতমানস* গ্রন্থে বলেন :

> ...নজরুল প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষতা করেন। পরে এই আন্দোলনের বিফলতা দেখে সন্ত্রাসবাদকেই তিনি বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরেন। মধ্যবিত্ত বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যেই এই সন্ত্রাসবাদের সমর্থক ছিল বেশী। (গুপ্ত, ১৩৯৫ : ৩০৫)

আখ্যানে বিপ্লবী বজ্রপানির মুসলমান যুবকদের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য খণ্ডন করার তাগিদ থেকে জমিদার পরিবারের সন্তান জাহাঙ্গীর বিপ্লববাদে যোগ দেয়। বিপ্লবী অধিনায়ক বজ্রপাণির মতে, '...বাঙলার মুসলমান ছেলে বিপ্লববাদীর আদর্শকে গ্রহণ ক'রতে পারে না' (ইসলাম, ১৩৩৮ : ২০)। এই মতের বিপরীতে জাহাঙ্গীর চরিত্রটিকে বিপ্লববাদী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুসলমান সম্পর্কে উপন্যাসে হিন্দু বিপ্লববাদীদের অভিযোগ হলো, 'অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই হয় চাকুরী-লোভী, না হয় ভীরু...' (ইসলাম, ১৩৩৮ : ২০)। মুসলমান সম্পর্কে উত্থাপিত এ অভিযোগের অর্থ হলো— তারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে। ফলে হিন্দু বিপ্লবীদের মনে মুসলমানদের বিপ্লবী হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দ্বিধা দেখা দিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবীদের আলোচনা থেকে আখ্যানে লক্ষ করা যায়, তারা মুসলমানদের ইংরেজের মতো অভারতীয় হিসেবে চিহ্নিত করে :

> আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামীকে আজও পেরিয়ে যেতে পারিনি—ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি। এর জন্যে দায়ী আমাদেরি প্রতিদ্বন্দ্বী আর-এক বিপ্লব-সঙ্ঘের অধিনায়ক। ...
>
> [তিনি বলেন]—'আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গী এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে! সন্ধি কর্‌ব লণ্ডন এবং মক্কা অধিকার ক'রে! — তারা মুসলমানকে ইংরেজের চেয়ে কম শত্রু মনে ক'রে না। (ইসলাম, ১৩৩৮ : ২৩)

উদ্ধৃতিতে মুসলমানকে ইংরেজের সঙ্গে সমভাবে শত্রুভাবাপন্ন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এ থেকে মুসলমানকে বহির্ভারতীয় হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। মুসলমান সম্পর্কে এমন মনোভাব পোষণ ধর্মীয় উগ্র-জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। বিপ্লবীদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর *ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম* গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

> প্রথমে ... দলে মুসলমান সম্প্রদায়ের ছেলে লওয়া হইত, কিন্তু এ সময়ে জনকতক ছাড়া মুসলমান বিপ্লববাদী বেশী পাওয়া যায় নাই। কিছুদিনের জন্য মুসলমান সভ্য লওয়া বন্ধ করা হইয়াছিল, কিন্তু শীঘ্র আবার লইবার হুকুম হইয়াছিল। তবে পরস্পরের স্বাভাবিক অবিশ্বাসের জন্যই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, পরে মুসলমান সভ্য আর পাওয়া যায় নাই। মুসলমান সমাজ তখন পর্য্যন্তও বিপ্লববাদের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। পরে ব্রাহ্মসমাজের লোকও পাওয়া যায় নাই। কাজেই বিপ্লববাদ সনাতনী হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থানকারীদের দলে ছিলেন। কাজেই বিপ্লববাদ হিন্দু-জাতীয়তায় পরিণত হইল। এইজন্য মুসলমান

> বিপ্লববাদীরা বলেন যে, হিন্দুরা প্রথমে তাহাদের বিশ্বাস করিতেন না, তাহারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচার না করিয়া হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতেন। (দত্ত, ১৯৮৩ : ১৬-১৭)

মুসলমানদের বিপ্লবে অংশগ্রহণ করা ও না-করার প্রসঙ্গে দুধরনের চিত্র লক্ষ করা যাচ্ছে, প্রথমত, হিন্দু বিপ্লবীরা তাদের সম্পর্কে অবিশ্বাস পোষণ করেছে— এই অর্থে যে, মুসলমানেরা ইংরেজের অনুচর হিসেবে বিপ্লবীদের গোপনীয়তা ফাঁস করে দেবে। দ্বিতীয়ত, হিন্দু বিপ্লবীরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচার না করে, হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছে। এই দুই প্রেক্ষাপট থেকে মুসলমানদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা তাদের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী যে-ধারণা পোষণ করতো বিপ্লবীরা তা থেকে ব্যতিক্রম হয়নি। তারা মুসলমানকে অভারতীয় মনে করে। আখ্যানে এ প্রসঙ্গে প্রমত্তকে উদ্দেশ্য করে সমরেশ বলে :

> তারা [মুসলমান] মনে করে, আমাদের স্বদেশী আন্দোলন মানে হিন্দুরাজের প্রতিষ্ঠা, কাজেই তারা এতে যোগদান করাকে মনে করে পাপ। তারাও সব হা-পিত্যেশ ক'রে তীর্থের কাকের মত আরব কাবুল ইরাণ তুরাণের দিকে চেয়ে আছে—কখন্ ঐ দেশের মিঞা-সায়েবরা এসে ভারতজয় ক'রে ওদের ভোগ করতে দিয়ে যাবে। (ইসলাম, ১৩৩৮ : ২৬-২৭)

মুসলমান সম্পর্কে উদ্ধৃতির মন্তব্যে সমরেশ তাদেরকে আরবকেন্দ্রিক জাতি হিসেবে নির্দেশ করেছে। এতে জাতি ধারণাটি ধর্মীয় পরিচয় দ্বারা নির্ধারণের ইঙ্গিতবাহী হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে খেলাফতকেন্দ্রিক মুসলিম-সংহতি পোষণের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। অপরদিকে বিপ্লববাদী আন্দোলনে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রদর্শন ছিল প্রবলধর্মী। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে প্রমত্ত সমরেশকে বলে, '...মুসলমানেরা যদি হিন্দুরাজের ভয় করেই, তাতে তাদের বড় দোষ দেওয়া চলে না সমরেশ! মাতৃ-সমিতির অধিনায়কদের মত্ নাকি হিন্দুরাজেরই প্রতিষ্ঠা' (ইসলাম, ১৩৩৮ : ২৭)। বিপ্লববাদীদের ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকসূত্র থেকে দেখা যায় :

> জাতীয়তাবাদ আর্য্যামি বা গোঁড়া হিন্দুয়ানিতে পরিণত হইয়াছিল। ...'হিন্দু স্বাধীনতাবাদীদের হিন্দু জাতীয়তাবাদ উদ্দেশ্য'—ইহা নেহাৎ মিথ্যা উক্তি নহে। বঙ্গীয় স্বাধীনতাবাদীদের মধ্যে অনেকেই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং এক্ষণেও অনেকে আছেন। ...এই সময় অনেক ব্রাহ্ম যুবক আমাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন যাঁহাদের কেহ কেহ আবার সনাতন হিন্দু হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তাহারা জাতব্রাহ্ম হইলেও সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মসমাজে একঘরে হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ইহাও জাতীয়তাবাদের ফল অর্থাৎ ভারতীয়-জাতীয়তা তখন হিন্দুধর্ম্মে পুনরুত্থানকারীদের ছায়ায় আসিয়া আর্য্যামী ও হিন্দুজাতি পুনরুত্থান মতবাদেই পরিণত হইয়াছিল। (দত্ত, ১৯৮৩ : ১৬)

বিপ্লববাদীদের 'আর্য্যামী ও হিন্দুজাতি পুনরুত্থান' ভাবনা এবং কার্যপন্থা মূলত ভারতকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রকল্প হিসেবে উপস্থাপন করেছে। সেক্ষেত্রে তাদের আকাঙ্ক্ষা— ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন হয়ে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের আত্মপরিচয় নির্মাণ করা। এই প্রকল্পে ভারতীয় মুসলমানেরা তাদের ভাবনায় নেই। এ ধারণার বিপরীতে আখ্যানে প্রমত্তর মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে :

> আমার ভারত এ-মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম! আমি তোদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি আমি শুধু ভারতের জলবায়ু মাটি পর্ব্বত অরণ্যকেই ভালো-বাসি নাই!

> আমার ভারতবর্ষ—ভারতের এই মূক দরিদ্র নিরন্ন পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটী মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইণ্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়, —আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে-যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ। কত অশ্রু সাগরে চড়া প'ড়ে প'ড়ে উঠ্ল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ! ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মস্‌জিদ্‌ের ভারতবর্ষ নয়, —এ আমার মানুষের মহা-ভারত!" (ইসলাম, ১৩৩৮ : ২৯)

উদ্ধৃতিতে প্রমত্তের এই ভাবনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রূপ। এই ভাবনা থেকে ভারতে ব্রিটিশের বিপক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম সার্বজনীন রূপ পায়। এর ফলে সৃষ্ট ভারতচেতনা বা স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পিনাকী ফাঁসি বরণ করে নিয়েছে এভাবে :

> ফাঁসির পূর্ব্বে ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি কি কাউকে দেখ্‌তে চাও?
>
> পিনাকী হাসিয়া বলিয়াছিল, চাই, কিন্তু তুমি তা দেখাতে পার্‌বে না!
>
> ম্যাজিষ্ট্রেট তার শিশুর মতো মুখের পানে তাকাইয়া জোরের সঙ্গে বলিয়াছিল, নিশ্চয়ই পার্‌ব! বল কা'কে দেখতে চাও!
>
> পিনাকী তেমনি মধুর হাসিতে মুখ আলো করিয়া বলিয়াছিল, আমি চাই ভারতের স্বাধীনতা দেখ্‌তে! (ইসলাম, ১৩৩৮ : ৯৯)

ফাঁসিকাষ্ঠে দণ্ডের পূর্ব মুহূর্তে শেষ ইচ্ছা হিসেবে পিনাকীর ভারতের স্বাধীনতা দেখতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাহাঙ্গীর পুলিশের কাছে ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হয়েছে। *কুহেলিকা* উপন্যাসে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করে মুক্ত স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য শহিদ হওয়া বা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয় চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গকালীন বাঙালি মুসলমানের সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক—এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে কাজী ইমদাদুল হক রচনা করেন *আবদুল্লাহ্* (১৯৩৩) উপন্যাস। ইংরেজ উপনিবেশে বাঙালি মুসলমানের ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক আরবি ও ফারসি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখতার কারণে হিন্দুদের তুলনায় তারা পশ্চাৎপদ ছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহার কারণে বাঙালি মুসলমান চাকরিক্ষেত্রেও সংকটের মুখোমুখি হয়। এ সংকট থেকে উত্তরণে সহায়তা করেন নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। তাঁরা পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। আবদুল্লাহ্ উপন্যাসে মুসলমানের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখতা ও সচেতনতার চিত্র যুগপৎ লক্ষ করা যায়।

তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজে এরকম ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ইংরেজি শিক্ষিত ছেলেরা ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মানে না। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্‌ও ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে তার পিতা মন্তব্য করে :

> ইংরেজী পড়িয়া সচরাচর ছেলেরা যেমন বিগড়াইয়া যায়, আবদুল্লাহ্ তেমন বিগড়ায় নাই। সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে; পাকা মুসল্লির মত সকল বিষয়েই বেশ পর্‌হেজ করিয়া চলে। (হক, ২০১৯ : ১১)

উদ্ধৃতিতে বিগড়ে যাওয়া অর্থে ইসলামের কায়দাকানুন থেকে বিচ্যুত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এজন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রতি কট্টর বিমুখতা লক্ষ করা যায় সৈয়দ আবদুল কুদ্দুসের মধ্যে। পুত্র আবদুল

কাদের মাদ্রাসা ছেড়ে স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করায় তার পড়ালেখা বন্ধ করে দেয় সে। সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস হলো বাঙালি মুসলমানের পশ্চাৎপদ প্রতিনিধি—যারা মুসলমানের ইংরেজি শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা এসব বিষয়ে কট্টর মনোভাবাপন্ন অবস্থানে ছিল। এরকম স্বধর্মীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বাঙালি মুসলমানকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। একদিকে শিক্ষিত হিন্দুদের আধিপত্য ও অগ্রসরতা অপরদিকে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা এবং কলকাতায় যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার সংকটের ফলে তাদের চাকরিপ্রাপ্তি সহজ ছিল না। এই চিত্র উপন্যাসে উঠে এসেছে এভাবে :

> কলিকাতায় এক মাদ্রাসা ভিন্ন তখন আর মুসলমান স্কুল ছিল না; সেখানে একটা চাকুরী খালি পাইয়াও, আর একজন বিহারবাসী উমেদারের বিপুল সুপারিশের আয়োজনের সম্মুখে সে তিষ্ঠিতে পারিল না।
>
> ... আবদুল্লাহ্ কাহারও বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষকের কাজও খুঁজিতেছিল। কিন্তু মুসলমানগণের ঘরে বড় জোর পাঁচ টাকায় আম্‌পারা এবং উর্দু পড়াইবার কাজ মিলিতে পারে; তাও আবার ইংরেজী-পড়া লোক দেখিলে লোকে আমল দিতে চায় না।' (হক, ২০১৯ : ৮৫)

কলকাতায় বাঙালি মুসলমানের এ ধরনের সংকটের পাশাপাশি আরও লক্ষ করা যায়, শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। এর ফলে মুসলমান কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা ইংরেজি শিক্ষিত ছেলেদের কলকাতায় চাকরি পাওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে। কারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার বিকাশ অনেক আগেই ঘটেছিল। হিন্দুদের অগ্রসরতা সম্পর্কে উপন্যাসে ইংরেজ সাহেব আকবর আলীর উদ্দেশে বলেছে :

> ...হিন্দুরা লেখাপড়া শিখে কেমন উন্নতি ক'রে ফেলেছে—অপিসে আদালতে কি ব্যবসায়-বাণিজ্যে, যেখানে যেখানে দেশীয় লোক দেখতে পাই, কেবলই হিন্দু—কৃচিৎ কালে-ভদ্রে একজন মুসলমান নজরে পড়ে। ক্রমে এরাই দেশের সর্বেসর্বা হ'য়ে উঠবে, দেখতে পাবেন, আপনারা কেবল কাঠ কাঠবার জন্যে প'ড়ে থাকবেন। (হক, ২০১৯ : ৮১)

উদ্ধৃতির এই উক্তি প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী অনগ্রসরমান মুসলমান সমাজের চিত্র নির্দেশ করেছে। মুসলমানেরা কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে যে সকল সংকটের মুখোমুখি হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে দেখা যায় :

> পেশকার বাবু কহিলেন,—"সব মুন্সী কোত্থেকে জোটাচ্ছে, কে জানে! এক নেড়ে যখন ঢুকেছে, তখন নেড়েয় নেড়েয় মক্কা হ'য়ে যাবে দেখতে পাবেন;—আর আজকাল ত মুন্সীর পোয়া বারো! সাহেবের ভারী সুনজর! এই দেখুন না, কারু সঙ্গে সাহেব দুই তিন মিনিটের বেশী আলাপ করেন না, আর মুন্সী প্রায় ঘন্টা খানেক ধ'রে সাহেবের সঙ্গে খোশআলাপ ক'রে এল!" অপর এক বাবু কহিলেন,—"তা হবে না? আজকাল যে ওরা গভর্নমেন্টের পুষ্যি পুত্তুর হ'য়ে উঠেছে।" তাহার পর তিনি চক্ষু দুটি ঘুরাইয়া কহিলেন,—"সার্কুলার বেরুচ্ছে চাক্‌রী খালি হলে এখন নেড়েরাই পাবে। নেড়ে এ্যাপয়েন্ট না করতে পারলে আবার কৈফিয়ৎও দিতে হবে!..." (হক, ২০১৯ : ৮৩)

উপন্যাসে বর্ণিত এ অংশটি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তৎকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান অনেক বেশি পশ্চাৎপদ ছিল। তারপরেও মুসলমানের মধ্যে যারা সরকারি চাকরির চেষ্টারত ছিল তাদের এধরনের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। বলা যায়, এ সংকট ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানের

মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠনের চেতনা তৈরি করে। উপন্যাসে বাঙালি মুসলমানের চাকরিপ্রাপ্তি সম্পর্কে হিন্দু হেডমাস্টার ঈর্ষা পোষণ করে বলে :

> আজকাল যে সব গভর্নমেন্ট সার্কুলার বেরুচ্ছে, মুসলমান হ'লেই সে চাক্‌রী পাবে, তা কি আপনি জানেন না?
>
> ... এই তো সেদিন আপনাদেরই জাতের একজন সবরেজিস্ট্রারী পেয়ে গেল, সে ত ফোর্থ ক্লাস পর্যন্তও পড়েনি। ... তবু সাহেব কেবল মুসলমান দেখেই তাকে চাক্‌রী দিয়েছেন—(হক, ২০১৯ : ৮৮)

বস্তুতপক্ষে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন মন্তব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। একজন মুসলমানের চাকরি প্রসঙ্গে একটি নিয়োগ বোর্ডের সভায় হিন্দু-সাম্প্রদায়িক মনোভাব উপন্যাসে লক্ষ করা যায় এভাবে :

> উকীল বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তা ও দু'ব্যাটাই ত নেড়ে, ওর আবার ভাল-মন্দ কি? একটা হ'লেই হ'ল।"
>
> হেডমাস্টার কহিলেন,—"আরে না মশায়, এর ভিতর কথা আছে। এ-লোকটা পি-এল্ লেকচার 'কমপ্লীট' ক'রেছে, এখন এক্‌জামিন দিয়ে পাশ ক'ল্লেই চাকরী ছেড়ে দেবে, আমি সঠিক খবর জানি। ছেড়ে দিলে একটা 'প্লী হ'ত, নেড়েগুলো 'স্টিক্' করে না তাতে কাজের বড্ড 'ডিসলোকেশন' হয়। তারপর নিজেদের [হিন্দু] একটা লোক নেওয়া যেত।"
>
> উকীল বাবুটি একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন,—"আপনি একটু আগে কেন বলেননি? আমরা তো এর কিছুই জানি না। জানলে নিশ্চয়ই এ জন্যে ভোট দিতাম।" (হক, ২০১৯ : ৯০)

উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, একজন মুসলমানের চাকরি হওয়ার ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের মনে প্রতিহিংসা লক্ষ করা যাচ্ছে। মুসলমানের প্রতি হিন্দুর এমন বিদ্বেষ শুধু চাকরি ক্ষেত্রেই জারি থাকেনি, বাড়ি ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রেও তা বজায় থাকে। মুসলমান হওয়ার কারণে ভদ্রপাড়ায় আবদুল কাদের বাড়ি ভাড়া পায়নি। ঘটনাটি ছিল এরকম :

> ...শশীবাবু গভীর দুঃখব্যঞ্জক সুরে কহিতে লাগিলেন,—"কি ক'রব, মৌলবী সাহেব, বাড়ীটা তো আপনাকে দেব ব'লে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু ও-দিকে এক বিষম বাগড়া পড়ে গেল..."
>
> ...
>
> "আমাদের বারের প্রেসিডেন্ট অতুল বাবু ঐ পাড়াতেই থাকেন কি না—তা তিনি এবং আরও পাঁচজনে ব'লেছেন, ও-পাড়ায় ভদ্দর লোকের বাস, ওখানে মুসলমানকে বাড়ী দিলে সক্কলকারই অসুবিধে হবে...। (হক, ২০১৯ : ১০৫-০৬)

মুসলমান হওয়ার কারণে ভদ্রলোকের পাড়ায় বাড়িভাড়া না-পাওয়ার বিষয়টিতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন চিত্র ধরা পড়েছে। এক্ষেত্রে মুসলমানকে 'ভদ্রলোক' বিবেচনা করা হয়নি। ফলে মুসলমান তার ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে সংকটে পড়েছে। জয়া চ্যাটার্জী তাঁর *বাঙলা ভাগ হল* গ্রন্থে ভদ্রলোকের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

> বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভদ্রলোক পরিচিতির একমাত্র একক নিদর্শন যদি কিছু থেকে থাকে তা নিঃসন্দেহে তাদের 'সংস্কৃতি'। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভদ্রলোকেরা নিজেদেরকে সংস্কৃতিবান একটি গ্রুপের লোক বলে গণ্য করতে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে তারা নিজেদেরকে একটা বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

> তথা 'বাংলার নবজাগরণে'র উত্তরাধিকারী হিসেবে দেখতে শুরু করেন। (চ্যাটার্জী, ২০১৮ : ১৮০)

উদ্ধৃতি অনুসারে বলা যায়, সেক্ষেত্রে মুসলমানেরা সংস্কৃতিবান হিসেবে হিন্দুর চোখে স্বীকৃত হয়নি। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ও রচনাকাল উভয়েই ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সে-সময়ের চিত্র যখন ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে (হক, ২০১৯ : ১০৭)। আর এ সময়ে হিন্দুপাড়ায় মুসলমানকে ভাড়িভাড়া না দেওয়ার চিত্র উঠে এসেছে। একই দেশ, একই শাসকের অধীন থাকার পরেও শুধু ধর্মীয় কারণে বৈষম্যের শিকার ব্যক্তিমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই ক্ষোভ থেকেই ভারতীয় মুসলমানের নিজস্ব ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের চেতনা তৈরি হয়েছে—যা পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ হিসেবে পরিচিতি পায়। উপন্যাসে মুসলমানের ধর্মকেন্দ্রিক পরিচয়-সংকট আত্মপরিচয়ের সংকটে পরিণত হয়েছে। আবদুল কাদের ও শশীবাবুর মধ্যে কথোপকথনে তা এভাবে উঠে এসেছে :

> "...যেমন ধরুন না, বাঙ্গালী ব'ল্লে আপনারা [মুসলমানেরা] বাঙ্গালী হিন্দুকেই বোঝেন..."
>
> কই তা তো বুঝিনে—আমরাও তো বাঙ্গালী..."
>
> "আমি অনেক মুসলমানকে ব'লতে শুনিছি,—"মুসলমানরো আজকাল ধুতি প'রে বাঙ্গালী সাজে। এর মানে কি?"
>
> "এর মানে এই যে, অনেক মুসলমান ভিন্ন দেশ থেকে এসে এখানে বাস ক'চ্ছে কি-না তাই তারা এদেশের আসল বাশিন্দাদের বাঙ্গালী বলে; কিন্তু তাই ব'লে আপনারা হিন্দু ব'লেই যে 'ভদ্র' নামের অধিকারী, আর কেউ ভদ্রলোক নয়, এমন করা কি ঠিক? (হক, ২০১৯ : ১০৬)

উদ্ধৃতিতে বাঙালি সত্তার পরিচয়কেন্দ্রিক এক ধরনের বিভাজন লক্ষ করা যায়। হিন্দু বলতে বাঙালি বোঝানো হয়েছে, কিন্তু বাংলাভাষী মুসলমানের ক্ষেত্রে বাঙালি পরিচয় তেমনটি হয়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষী মুসলমানকে 'বাঙালি মুসলমান' হিসেবে পরিচিত করানো হয়েছে। বাঙালি মুসলমানের এই পরিচয় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে। বাঙ্গালীসমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙ্গালী মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য্য। (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৯৩ : ৩৬৩)

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি সমাজের নিম্নস্তরে বাঙালি মুসলমানের স্থান দেখিয়েছেন। এই সূত্র ধরে বাঙালি মুসলমান আর্য হিন্দু, অনার্য্য হিন্দু ও আর্য্যানার্য্য হিন্দুর চোখে ভদ্রলোক শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে না। এতে ভদ্রলোক হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একধরনের বিভাজন চলতে থাকে—যা পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস তৈরির পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সংঘাতও সৃষ্টি করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে এই সংকটের তীব্রতা ঘনীভূত হয় যখন মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ফলে চাকরি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করে।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি ভারতীয় জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে বিভাজন তৈরি করে। এতে ঔপনিবেশিক শাসকেরা এর ফায়দা নেয়। পরবর্তী পর্যায়ের উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনেও হিন্দু-মুসলমানের এই ব্যবধান ক্রিয়াশীল থাকে।

উপর্যুক্ত উপন্যাসসমূহে বাঙালি মুসলমান ঔপন্যাসিকগণ ইংরেজ উপনিবেশে তাঁদের জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয়ের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা উনিশ শতকের হিন্দু ঔপন্যাসিকদের ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। যার ফলস্বরূপ সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তাঁরা ধর্মকেন্দ্রিক আত্মপরিচয় নির্ধারণের মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদকে উপস্থাপন করেছেন। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান হলেও তাঁর উপন্যাসে উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। আর এটাই হলো সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপ। কারণ ধর্মকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী পরিচয় নির্ধারিত হলে রাষ্ট্রের অপরাপর ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইংরেজ উপনিবেশে অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে ধর্মীয় জাতীয় চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে।

তথ্যসূত্র

আহসান, কামরুল (২০১৪), 'ভূমিকা' *রায়নন্দিনী*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

ইসলাম, কাজী নজরুল (১৯৯১), *মৃত্যুক্ষুধা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

— (১৩৩৮ ব.), *কুহেলিকা*, ডি. এম লাইব্রেরি, কলিকাতা।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১৮), *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

খান, শামসুজ্জামান (২০১৫), 'ভূমিকা', *বিষাদ-সিন্ধু*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

গুপ্ত, সুশীলকুমার (১৩৯৫ ব.), *নজরুল চরিতমানস*, দে'জ পবিলিশিং, কলিকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র (১৩৯৩ ব.), 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', *বঙ্কিম রচনাবলী*, তুলি-কলম, কলকাতা।

চ্যাটার্জী, জয়া (২০১৮), *বাঙলা ভাগ হল : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ (১৯৮৩), *ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা।

দাশগুপ্ত, রাহুল (২০১৭), *বাংলা উপন্যাসকোশ (১৮২৫-২০১৫)*, প্রতিভাস, কলকাতা।

পারভেজ, মো. মাসুদ (২০২৪), 'উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে জাতীয় চেতনার রূপ', *ভাষা-সাহিত্য পত্র*, সংখ্যা ৫০, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

সিরাজী, ইসমাইল হোসেন (২০১৪), *রায়নন্দিনী*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

হক, ইমদাদুল (২০১৯) *আবদুল্লাহ্*, ঐতিহ্য, ঢাকা।

হোসেন, মীর মশাররফ (২০১৫) *বিষাদ-সিন্ধু*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Anderson, Benedict (2006), *Imagined Communities*, Verso, London, Revised edition.

Salzbach, Walter (1943), *National Consciousness*, American Council on Public Affairs, Washington D.C.

[**Abstract:** No trace of novels written by Muslim novelists can be found in the initial stage when Bengali novels emerged as a literary genre. Mir Mosharraf Hossain's (1847-1911) *Bishad-Shindhu* (1891) came out twenty-five years after Bankim Chandra Chatterjee's (1838-1894) novel *Durgeshnandini* (1965). Before that no evidence exists of Bengali Muslim authors writing any novel, though Bengali Muslims have a long legacy of literary creation. The trend that

was set through the composition of *Bishad-Shindhu* gradually evolved and included, besides literary matters, religious, social and political aspects as themes. Indeed, the aspiration for self-identity that took root during the colonial era among the Bengali Muslims cast influence on the contemporary novels. Consequently, nationalistic fervor found eloquent expression in the novels by Bengali Muslim authors. In this backdrop this article aims to throw light on the nature of national consciousness and identity politics of Muslims reflected in the novels by Bengali Muslim authors.]